পরকাল ভাবনা

(evsjv)

أهمية التفكير في الآخرة

[اللغة البنغالية]

gj : gnv¤§` kvgQj nK wQwÏK

مؤلف : محمد شمس الحق صديق

m¤úv`bv : gnv¤§` kvgQj nK wQwÏK

مراجعة : محمد شمس الحق صديق

Bmjvg cPvi e¨‡iv, ivelqvn, wiqv`

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة الرياض

1429 - 2008

সংকট

আধুনিক বিশ্বে মানুষের সবচেয়ে বড় গুরুত্বের বিষয় কোনটি ? কোন বৈঠকে এ-প্রশ্ন করা হলে একেক জন একেক উত্তর দিবেন; কেউ বলবেন, ব্যাপকবিধ্বংসী অস্ত্রের উৎপাদন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মজুদ কীভাবে ঠেকানো যায় এটাই আধুনিক বিশ্বের সমধিক গুরুত্বের বিষয়। কেউ বলবেন, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রতিহত করাই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আবার কেউ বলবেন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ বন্টন নিশ্চিত করণই আজকের বড় সমস্যা। এর অর্থ, মানুষ এখনো অন্ধকারে রয়েছে তার পরিচয় বিষয়ে; আবিষ্কার করতে পারেনি নিজের অস্তিত্বের ধরন-ধারণ; পারলে ভিন্নরকম হত সবারই উত্তর। সবাই বলতো, সবচেয়ে বড় সমস্যা আধুনিক মানুষের পরিচয় বিস্মৃতি। মানুষ তার মূল পরিচয় ভুলে গেছে বেমালুম; নশ্বর ইহজগৎ ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে অবিনশ্বর পরজগতে, যেখানে তাকে দাঁড়াতে হবে প্রতিপালকের সামনে যাপিত জীবনের হিসেব দিতে, এ-বিষয়টি বিদায় নিয়েছে তার মস্তিষ্কের সচেতন অংশ থেকে; অন্যথায় এ-খন্ডকালিক অস্তিত্বের জগতকে নয়, অনন্ত পরকালকে, স্রষ্টার মুখোমুখী হওয়াকে, স্বর্গ-নরকের সম্মুখীনতাকে সবচেয়ে বড় বিষয় বলে মনে করতো সে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سورة الأعلى : ١٦-١٧

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাকো। অথচ আখেরাতের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। (সূরা আ'লা ১৬-১৭)

আল্লাহ ও পরকালে মানুষের বিশ্বাস সম্পূর্ণ উঠে গেছে, একথা বলছি না। এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসীদের দলভুক্ত। কিন্তু এ-বিশ্বাসের শিহরণ ঝিমিয়ে পড়েছে বর্ণনাতীতভাবে মানুষের অন্তর ও বহির্জগতে। মানুষের সচেতন মেধার অংশ হিসেবে মোটেই মন্থিত নয় এ-অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসটি। এ-পৃথিবীর জীবনে, অর্থবিত্ত যশ-জৌলুসের পাহাড় গড়ে কীভাবে উন্নতির চরমে পৌঁছানো সম্ভব সে স্বপ্নেই বিভোর থাকে মানুষ দিবস-রজনী। ইরশাদ হচ্ছে :

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر- سورة التكاثر : ١-٢

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকেমোহচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। (সূরা তাকাছুর :১-২)

বিশ্বের মধ্যাকর্ষণ শক্তি বিলুপ্তপ্রায় এবং ঘন্টায় ছ'হাজার মাইল বেগে আমাদের পৃথিবী ধেঁয়ে চলেছে সূর্যের দিকে, কোন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এধরনের নিশ্চিত কোনো সংবাদ পরিবেশিত হলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে একে অপরের ওপর, শুরু হবে স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার অভাবিতপূর্ব প্রতিযোগিতা, প্রচন্ড দৌড়ঝাঁপ; কেননা এ ধরনের সংবাদের অর্থ-কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিপর্যস্ত হবে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, সমস্ত জনপদ জৈব ও জড় সব কিছুই। অবসান ঘটবে জীবন বৈচিত্রের, এ-নিসর্গলোকের।

এ ধরেনের কোনো সংবাদ আমাদের কানের পাতায় আঘাত হানছে না বলে নিজেদেরকে মনে করছি অনেক নিরাপদ, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না, এর থেকে ভয়ংকরতম এক পরিণতির দিকে নিরন্তর ছুটে চলেছে আমাদের এ পৃথিবী। কিন্তু এ-ব্যাপারে উদ্বেগ উৎকন্ঠার স্পর্শ কাউকে পেয়েছে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হতে পারে- কী সেই সঙ্গিন পরিণতি যার ভয়াবহতায় কাতর হতে হবে আমাদের ? তা হলো মহা-প্রলয়দিবসের ভয়াবহতা যা সুনির্ধারিত হয়ে আছে মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন থেকেই। যার কঠিন থাবা থেকে রেহাই পাবে না কেউ; পাওয়ার আদৌ কোনো সুযোগও নেই। তিক্ত সত্য হলো, মানুষ এ-দুর্লজ্ঘ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। বিশ্বাসের জগতে অধিকাংশ মানুষ এ-বিষয়টিকে মানে, কিন্তু বাস্তবে এমন লোকের উপস্থিতি খুব কমই যারা প্রদীপ্ত চেতনা নিয়ে এ-বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যদি গোধূলিলগ্নে আপনি কোন জনাকীর্ণ বাজারের ধারে দাঁড়িয়ে যান, জানতে চেষ্টা করেন কী জন্য মানুষের এই

ভিড়, তাহলে সহযেই বুঝতে পারবেন কিসের পেছনে মানুষের এই অনন্ত দৌড়ঝাঁপ, আনাগোনা। একটু ভেবে দেখুন কী জন্য বাজারে যানবাহনের চলাচল, দোকানদার কী উদ্দেশে বিচিত্র পণ্যে সাজিয়েছে তার দোকান। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ কোথায় যাচ্ছে? তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু কী? কী জন্য একে অন্যের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছে? কোন জিনিস মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করছে? মানুষের উত্তম-যোগ্যতাসমূহ কোথায় ব্যয় হচ্ছে? তাদের অর্থবিত্ত কোথায় খরচ হচ্ছে? কোন জিনিসের অভাব তাদের নিদ্রা হারাম করে দিচ্ছে? মানুষ কী নিয়ে বেরুচ্ছে ? কি নিয়ে ফিরে আসছে? মানুষের এই অচ্ছেদ ব্যস্ততা, তাদের মুখ-নিঃসৃত কথামালা, তাদের প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া নিরীক্ষা করে যদি উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর ঘেঁটে বের করতে চান তাহলে সহযেই বুঝে যাবেন কিসের পেছনে মানুষের এই উন্মত্ততা, কোন বিষয়কে মানুষ তার জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয় হিসেবে করে রেখেছে সাব্যস্ত।

স্বীকার করতেই হয়, শহরে-বন্দরে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন আনাগোনা, ব্যস্ততম পথে অনবরত যাতায়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে--- মানুষ তার বসুতনির্ভর খায়েশ ও রক্তমাংশের প্রয়োজন মেটানোকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে সাব্যস্ত করে নিয়েছে। পরজগৎ নয় বরং ইহজগতের বিচিত্র চাহিদা পূরণকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। মানুষকে উৎফুল্ল দেখালে বুঝে নিতে হবে তার কোনো পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয়েছে। আজকের প্রয়োজন, আজকের সুযোগ-সুবিধা, আজকের ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ ইত্যাদি একটি বিশেষ মাত্রায় অর্জন করতে পারাটাই যেন জীবনের সফলতা। এটাই সে বিষয় যার পেছনে ব্যয় হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম যোগ্যতা, ক্ষরিত হচ্ছে প্রদত্ত শক্তি, সাহস। আসছে কিয়ামত দিবসের ভাবনা কারও নেই। প্রতিটি ব্যক্তির ম্যারাথন দৌড়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্তমান নিসর্গ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে কাফেরদের বক্তব্য নকল করে বলেন :

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما نحن بمبعوثين – المؤمنون : ٣٧

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা যদি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবনা। (সূরা মুমিনূন : ৩৭)

বড় শহরগুলোর অবস্থাই যে কেবল এরকম, কথা ঠিক নয়। বরং যেখানেই রয়েছে মানুষের বসতি সেখানেই এ-অবস্থা অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃষ্টিগ্রহ্য। আপনি যাকেই টোকা দিবেন, পরখ করতে চাইবেন, তাকেই এ-বিষয়টির বন্দনায় নিষ্ঠাবান পাবেন। কি পুরুষ কি নারী, কি আমীর কি গরীব, কি যুবক কি বৃদ্ধ, কি শহুরে কি গেঁয়ো, কি ধার্মিক কি অধার্মিক সকলেই অভিন্ন পথের তীর্থযাত্রী। আজকের মানুষের সবচাইতে বড় আকুতি, এই নিসর্গে যা কিছু লভ্য সবই লুফে নিতে হবে দুহাত ভরে। 'ব্যয় করো এর পিছনেই তোমার সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা, মশগুল রাখো এ চিন্তাতেই তোমার দিবস-রজনী ' এ-শ্লোগানের পদধ্বনি যেন নিরন্তর ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে। অবস্থা দেখে মনে হয়, ইহকালীন ভোগ-সম্ভোগই একমাত্র দেবতা যার নজরানায় ঈমান ও আত্মোপলব্ধি কুরবানী করতেও মানুষ প্রস্তুত রয়েছে। মানুষ এখানেই সবকিছু পেয়ে যেতে চায়, তা যেভাবেই হোক, যেকোনো মূল্যেই হোক। কিন্তু এ-ধরনের সমস্ত সফলতা, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইহকালীন সফলতা। পরকালে এসমস্ত সফলতার থোরাই মূল্য রয়েছে। যে ব্যক্তি তার সমকালের নিসর্গকে সাজাতে ব্যস্ত সে পরকাল বিষয়ে নিঃসন্দেহে উদাসীন। যে ব্যক্তি তার যৌবনে বার্ধক্যের জন্য কিছুই সঞ্চয় করেনা, এ ব্যক্তির উদাহরণ ঠিক তারই মতো। ফলে বয়সের ভার বহনে সে যখন অক্ষম হয়ে পড়ে, শ্লথ হয়ে আসে গতিময়তা, হারিয়ে বসে কর্মক্ষমতা, তখন সে আঁচ করতে পারে : তার দাঁড়াবার মতো কোন জায়গা নেই, নেই মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই, গা ঢাকার কোন কাপড়, শোবার কোন বিছানা। কিন্তু বয়স তখন দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে এসে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি, গাত্র ঢাকার কাপড়, শোবার বিছানা, দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা ইত্যাদির পেছনে শ্রম দেয়ার কোন শক্তি সাহসই তার পতিত ছন্দের শরীরে আর থাকে না। সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মহাবিশ্বের তাবৎ বিষাদ বুকে ধারণ করে হয়তো কোনো বৃক্ষের শিকড়ে মাথা রেখে আকাশের বিশালতা মাপতে শুরু করে। কোন দেয়ালের গা ঘেষে উদাস দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা মুখ থুবরে পড়ে থাকে; উদভ্রান্ত কুকুরের দল তাকে ঘিরে ঘেউ ঘেউ করে, শিশুরা ছুড়ে মারে অজস্র পাথর। আমরা নিজ

চোখে এমন বহু ঘটনা দেখে যাচ্ছি, যা থেকে কিঞ্চিৎ হলেও আঁচ করা যায়, পরকালের জন্য যে ব্যক্তি কিছু উপার্জন করছে না তার পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। তবে এ বিষয়টি আমাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্যই সৃষ্টি করেনা। আমাদের অনন্ত স্থবিরতায় সৃষ্টি হয় না কোন আন্দোলন। আমারা প্রত্যেকেই বরং আমাদের 'আজ'কে নির্মাণে বড় ব্যস্ত। আগামীকালের জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছি না মোটেই। যুদ্ধের সময় যদি উৎকট আওয়াজে ঘোষিত হয়, শত্রু পক্ষের বিধ্বংসী বিমানসমূহ ধেঁয়ে আসছে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে, তাহলে সবাই কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে দৌড়ে পালাবে। জনাকীর্ণ রাজপথ নিমিষেই ঢাকা পড়বে শুনশান নিরবতার পুড়ো চাদরে। যদি কেউ এ অবস্থায় নিথর নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, যদি এমন পরিস্থিতিতেও কোনো চঞ্চলতা ছন্দ খুঁজে না পায় কারও শরীরে, অন্তরে, তাহলে সবাই তাকে নির্ঘাৎ পাগল বলবে, একথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়। এ-ধরনের উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতা এ-পৃথিবীর একটি ছোট বিপদকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। তবে এ-বিপদের থেকেও হাজারগুণে ভয়ংকর ,বীভৎসতম আর এক নিশ্চিত বিপদ আসছে, যার ঘোষণা স্রষ্টা নিজেই দিয়েছেন। বিশ্বপ্রতিপালক তাঁর প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন - মানুষ যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, অন্যের অধিকার যথার্থভাবে আদায় করে দেয়, একমাত্র তাঁরই মর্জি মোতাবেক জীবনযাপন করে; না করলে মুখোমুখি হতে হবে কঠিন শাস্তির। ইরশাদ হয়েছে :

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه :١٢٤

যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার জীবনযাপন সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ হিসেবে। [সূরা তাহা: ১২৪]

এমন শাস্তি যা অভাবিত, মর্মন্তুত, যা কখনো রহিত হবার নয়, এবং যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার থাকবে না কোনো সুযোগ। বিশ্ব-প্রতিপালকের এ-ঘোষণা প্রায় সবার কর্ণকুহরেই অনুরিত হয়েছে। মানুষও কোন-না-কোন ভঙ্গিতে এ-বিষয়ে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তর জগতে নজর দিলে, তাদের অবস্থা একটু মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করে দেখলে বুঝা যাবে যে, বিষয়টি আদৌ কোনো গুরুত্ব পায়নি তাদের অন্তরে, বাহিরে। তারা বরং এর উল্টো ইহকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশে এমনসব কাজ করে যাচ্ছে যা কখনো করা উচিত ছিলনা। জীবনের বিচিত্র স্রোতধারা নিষিদ্ধ অঞ্চলের দিকে কেবলই ধাবমান অত্যন্ত নির্বোধভাবে। অন্যকিছু নিয়ে ভেবে দেখার ফুরসত যেন কারো নেই। সামরিক বাহিনীর বিপদ সংকেতের অংশত শুনতে পেলেও দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে সবাই অজানা গন্তব্যের দিকে, পক্ষান্তরে বিশ্ব-প্রতিপালক যে বিপদের ঘোষণা দিলেন সে ব্যাপারে কাউকে সামান্যতম উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না। ঐশী বিপদঘন্টা শুনে নিরাপদ-আশ্রয়ের খুঁজে ছুটে যাওয়ার আগ্রহ যেন কারুরই নেই।

এর কারণ কী? সামান্য মনোযোগ দিলেই আমরা তা আঁচ করতে পারি। এর কারণ, সামরিক বাহিনীর হেড-কোয়ারটার থেকে ভেসে-আসা সতর্কসংকেত মানুষ আমলে আনছে, কেননা তা এই মাটির পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত, যেখানকার ঘটনাসমূহের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায়, দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়। এর বিপরীতে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে সতর্কসংকেত এসেছে তা মৃত্যু-পরবর্তী-জগতের বিষয়। আমাদের ও সে বিপদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর দেয়াল। এ-দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে আমাদের দৃষ্টি, দেখা যাচ্ছে না ওপারের বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের বহর, দেখা যাচ্ছে না বোমা, গ্রেনেড, আগুনের কুন্ডলী। এইজন্যে বিমান হামলার সতর্কসংকেত বেজে উঠলে সাথে সাথে মানুষ তা বুঝে নেয়, সতর্ক হয়, তা বিশ্বাস করে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পানে ছুটে চলে অভাবিত চঞ্চলতায়। কিন্তু আল্লাহ যে বিপদের সংকেত দিয়েছেন, তা মানুষের মধ্যে দানা পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে না। আল্লাহ আমাদেরকে কেবল দু'টো চর্মচোখই দান করেন নি যা স্থাপিত আমাদের চেহারার অগ্র-ভাগে। বরং তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আরেকটি চক্ষু যার দৃষ্টিক্ষমতা আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারে বহু দূরের বিষয়। এমনকি মোটা চাদরে ঢাকা পদার্থকেও এ-চোখ দেখে নিতে পারে। এ-চোখ হলো বুদ্ধির চোখ। এ-তৃতীয় চোখটির অব্যবহারই মানুষের বিশ্বাসহীনতার মূল কারণ। মানুষ তার চর্ম চোখে যা কিছু দেখে সেটাকেই বাস্তব মনে করে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির চোখকে কাজে লাগালে আমরা দেখতে পাবো, যা আমাদের চর্ম-চোখের সামনে নেই তা বহুমাত্রায় বেশি বিশ্বাসযোগ্য যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে তার তুলনায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, এমন একটি বাস্তব বিষয়ের নাম বলুন যা

সকলেই সমানভাবে বিশ্বাস করে, তাহলে সবাই এক কণ্ঠে বলবে : মৃত্যু। মৃত্যু এমন একটি বাস্তবতা যা অস্বীকার করার ক্ষমতা এখনো কারো হয় নি; কখনো হবে বলে মনে হয় না। মানুষ সমানভাবে এ-ও বিশ্বাস করে যে, যে কোনো মূহুর্তে মৃত্যু কড়া নাড়তে পাড়ে তার অস্তিত্বের দরজায়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, মৃত্যু যখন আসে তখন মৃত্যুমুখী ব্যক্তি সাধারনত যা করে তাহলো ছেলে-সন্তানের ভাবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়েদের কী হবে? কীভাবে চলবে লেখাপড়া অথবা ঘরসংসার? ইত্যাদি। অতীত জীবনের যে কয়টি বছর মাড়িয়ে এসেছে সেগুলোয় যদি মানুষ ব্যস্ত থেকে থাকে নিজেকে নিয়ে, তাহলে মৃত্যুর সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ছেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে তো সে সারাটা জীবনই করেছে উৎসর্গ। মৃত্যুর সময়ও তার হৃদয়ের প্রতিটি ভাঁজে বিরাজ করছে ছেলেসন্তানের পার্থিব ভবিষ্যতের ভাবনা। মত্যু-পরবর্তী সময়ে তার নিজের কী হবে না হবে সে বিষয়ে তাকে এখনো মনে হচ্ছে সমানভাবে উদাসীন। মনে হয় যেন মৃত্যুর পর কেবল তার ছেলে সন্তানেরই অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে; তার নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র থাকবে না কোথাও। অবস্থা দেখে মনে হয় - মৃত্যুর পর আরো-একটি জীবন রয়েছে এ বিষয়টি মানুষের অনুভূতির জগতে জাগ্রত নেই আদৌ।

আসলে মৃত্যুর পর মানুষ যখন সমাহিত হয় তখন মূলতঃ সে সমাহিত হয় না, চলে যায় আর-এক জগতে, এ-সত্যটি অনুধাবন করলে ছেলেপুলের নৈসর্গিক ভবিষ্যৎ নয়, নিজের পরকালীন ভবিষ্যৎ নিয়েই উৎকণ্ঠিত হতো সবচেয়ে বেশি, মৃত্যুর পর আমার কী হবে? এভাবনায় অস্থির হতো সবাই। মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে যায় না, এর সাথে সংযোজন ঘটে ভিন্নতর এক মাত্রার। মানুষের প্রবেশ ঘটে অন্যএক জীবনে যা বর্তমান জীবনের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ-সত্যটি, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ-সে হোক ধার্মিক বা অধার্মিক-ভুলে গেছে বেমালুম।

মৃত্যু-পরবর্তী-জীবন সম্পর্কে দু'ভাবে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এক. প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে যায়, আর তাই বুঝে আসে না কীভাবে সে জীবনপ্রাপ্ত হবে দ্বিতীয়বার।

দুই. মৃত্যু-পরবর্তী-জীবন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। আজকের পৃথিবীকে তো সবাই স্পর্শ করছে, চোখে দেখছে। কিন্তু পরবর্তী জগতকে কেউ কখনো দেখেনি। এজন্য আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, এ জীবনের পর অন্য আরো-একটি জীবন রয়েছে, যে জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা সবারই কর্তব্য। তাহলে আসুন পরকালীন জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। আমার যখন মৃত্যু হবে, নিশ্চিহ্ন হবে আমার শরীর মৃত্তিকাগর্ভে অথবা অন্য কোথাও এরপর আবারও কী ফিরে আসবে আমাতে জীবন স্পন্দন? এ-প্রশ্নটি এভাবে নির্দিষ্ট করে হয়তো খুব কম মানুষই নিজেকে করে থাকে। মৃত্যুর পর এক নতুন জীবনের মুখোমুখী হতে হবে এ কথায় যারা বিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় এ-বিশ্বাসটি অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। যে-ব্যক্তি পরবর্তী জীবন সম্পর্কে উদাসীন, উৎকণ্ঠিত নয়, সে তার আচরণে এ-কথাই প্রমাণ করে যাচ্ছে যে সে পরকাল বিষয়ে সন্দিহান। তবে ঐকান্তিকভাবে ভেবে দেখলে অত্যন্ত সহজেই এ-বষয়টির নিগূঢ় বাস্তবতা আবিষ্কার সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদিও পরজগতকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু তিনি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এমনসব নিদর্শন ছড়িয়ে দিয়েছেন যাতে ভেবে দেখলে পরকালীন সকল বাস্তবতা আমাদের বুঝতে সহজ হয়। উন্মুক্ত হয়ে যায় অনেক কিছুই। আসলে এ-মহাবিশ্ব একটি বিশাল দর্পণ যাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে পরবর্তী জগতের আকৃতি-প্রকৃতি। জন্মের দিন আমার শরীরের যে অবস্থা-আয়তন ছিল, বর্তমানে তা বহু পরিবর্তিত হয়ে শক্ত সুঠাম হয়েছে, দৈর্ঘে-প্রস্থে বেড়েছে। আসলে মানুষের শুরু অতি-সামান্য এক পদার্থ থেকে যা মাতৃগর্ভে বড় হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করে। মাতৃগর্ভের বাইরে এসে পরিপক্কতা অর্জন করে শক্ত সবল ব্যক্তিতে পরিণত হয়। খালি চোখে দেখা যায় না এমন একটি সামান্য পদার্থ থেকে বেড়ে ছ'ফুট লম্বা মানুষে পরিণত হওয়া এমন একটি ঘটনা যা প্রতিদিনই এ-পৃথিবীতে ঘটছে। আমাদের শরীরের অংশসমূহ যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরমাণুর আকারে ভূ-গর্ভে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তা পুনর্বার মানুষের আকৃতি ধারণ করতে-পারাটা বুঝে না আসার মতো কোনো বিষয় নয়। এ-পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি মানুষই মূলতঃ অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয় যা একিভূত হয়ে মানুষের রূপ পরিগ্র করার পূর্বে জমিন ও বায়ুমন্ডলের বিশালতায় ছড়িয়ে থাকে বিক্ষিপ্ত আকারে, যা ঐশী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয় মানুষের শরীরের অংশে। আমাদের মৃত্যুর পর শরীরের পরমাণুসমূহ বাতাসে-জমিনে ছড়িয়ে পড়ে। আবার যখন স্রষ্টার ইচ্ছা হবে একিভূত হবে যেমনটি

হয়েছিল প্রথমবার। প্রথমে একবার যে ঘটনা ঘটেছে তার পুনরবৃত্তি ঘটায় আশ্চর্যের কিছু নেই ; থাকার কোনো অর্থও হয় না। জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এর উদাহরণ জড়জগতে বহু রয়েছে। প্রতিবছর বর্ষাকালে আমরা দেখি, লতাগুল্ম, গাছপালা যৌবনপ্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর রূপলাবন্যে বিচিত্র মাদকতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আবার শুকনো মৌসুম আসে। যেখানে ছিলো সবুজের মাতামাতি সেখানে দেখা দেয় ধূসরতা। নেতিয়ে পড়ে সবকিছু। শুকিয়ে ঝড়ে যায় বহু লতাগুল্ম। এভাবে একটি জীবন শ্যামলতায় অবগাহন করে আবার ঝরে যায়, মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু পরবর্তী বছর যখন আবার বর্ষা শুরু হয়, বৃষ্টি নেমে আসে, তখন আবার জমিনে প্রাণ ফিরে আসে, জীবিত হয় এতদিন যা ছিল মৃত। শুকনো জমিনে আবারও হিন্দোলিত হয় দিগন্ত-জোড়া সবুজ। মানুষকেও মৃত্যুর পর অনেকটা এভাবেই জীবিত করা হবে পুনর্বার। মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে সন্দেহ এজন্যও জাগে যে, আমরা আমাদের অস্তিত্বটাকে শরীরী অবকাঠামোর আলোকে ভাবি। মনে করি বাইরে চলমান যে শরীর, সেটাই মানুষের মূল বাস্তবতা বা অস্তিত্ব। তাই যখন এই শরীরী খাঁচা ভেঙ্গে পড়ে, পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যায় তখন ভাবি সবকিছুর বুঝি অবসান ঘটলো। আমরা দেখি একটা জলজ্যান্ত মানুষ মূহুর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, চিরকালের জন্য চুপ হয়ে যাচ্ছে। চলমান শরীর নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত যোগ্যতা, শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে মাটির নিচে চাপা দিয়ে রেখে দেয়া হচ্ছে, অথবা কোনো কোনো সমপ্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী জ্বালিয়ে ভস্ম করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। যাকে মাটির নিচে সমাহিত করা হচ্ছে, ক'দিন যেতে না যেতেই তার শরীরের বিভিন্ন অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে জমিনের সাথে মিশে যাচ্ছে। বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার শরীরী অস্তিত্ব। একটি জলজ্যান্ত মানুষের এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে। যে মানুষটি এভাবে শেষ হয়ে গেলো সে কীভাবে আবার জীবনে ফিরে যাবে? এ যেন এক কঠিন ধাঁধাঁ। তবে একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবো যে আমাদের আসল অস্তিত্ব এই শরীরী অস্তিত্ব নয়। আমাদের আসল অস্তিত্ব অভ্যন্তর মানস যা ভাবে, চিন্তা করে, শরীরকে চালায়। যার উপস্থিতি শরীরকে রাখে সজীব-সতেজ-চলমান এবং অনুপস্থিতি তাকে করে মৃত, নিশ্চল। প্রকৃত অর্থে মানুষ বিশেষ কোন শরীরের নাম নয়। মানুষ ওই আত্মার নাম যা শরীরের মধ্যে বিরাজমান থাকে। আর আমরা জানি, শরীর অতি-ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে গঠিত যাকে জীবকোষ (Living Cell) বলে। মানুষের শরীরে কোষের একই অবস্থান যা একটি বিল্ডিং- এ ইটের। আমাদের শরীরী বিল্ডিং এর এই ইটগুলো, অথবা যাকে পারিভাষিক অর্থে কোষ বলে থাকি আমাদের কাজের সময়, নড়াচড়ার সময়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা এর ক্ষতিপূরণ করে থাকি। খাদ্য হজম হয়ে বিভিন্ন প্রকার কোষের জন্ম দেয় যা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের জায়গা দখল করে। মানুষের শরীর এভাবে সার্বক্ষণিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এ-কাজ প্রতিদিনই ঘটে, এবং কিছুদিন পর সমগ্র শরীর সম্পূর্ণ নতুন শরীরে রূপান্তরিত হয়।

mgvß